মানব উন্নয়নে বাংলাদেশ

আর কত দিন এভাবে

ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তমতে অপরিবর্তিত রয়েছে। মানে মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে, বাড়ছে মানব বঞ্চনা। অথচ ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদরা তা বরারবরই অস্বীকার করছেন।... লিখেছেন অনিরুদ্ধ ইসলাম ও আসজাদুল কিবরিয়া

বাংলাদেশ কি কেবল পিছিয়েই থাকবে? জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সদ্য প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০২ হাতে নিয়ে এ প্রশ্নটা সবার আগে জাগাটাই স্বাভাবিক। যদিও এই প্রতিবেদনের ভিত্তি ২০০০ সাল তবু প্রতিবেদনের তথ্য-পরিসংখ্যানগুলোকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই এজন্য যে, ১/২ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা রাতারাতি পাল্টে যায়নি, যেতে পারে না। বিশ্বের ১৭৩টি দেশের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল, শিক্ষাগত অর্জন ও প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে এই সূচক নির্ণয় করা হয়। প্রতিবেদনে ২০০০ সালে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মানব উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৫ সালের মধ্যে 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস' অর্জনের পথে এই দেশগুলো কতোটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে তারও একটি নিরীক্ষা রয়েছে।

ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১৭৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫তম। ২০০০ সালে বাংলাদেশের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত । ১৯৯৯ সালের সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৫তম। তার মানেই হলো বাংলাদেশ আসলে সামনের দিকে এগোতে পারেনি।

আরেকটু তীর্যকভাবে বললে বলা যায়, বাংলাদেশ বরং পিছিয়ে গেছে অনেক দেশের তুলনায়। দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বশীর্ষে রয়েছে মালদ্বীপ যার অবস্থান গতবারের ৮৬তম থেকে ৮৪তমে উন্নীত হয়েছে। এরপর রয়েছে শ্রীলঙ্কা ৮৯তম স্থানে। আগের বার অবশ্য শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছিল ৮৭তম। ভারত গতবারের ১২৬তম থেকে উঠে এসেছে ১২৪তম স্থানে। সার্কের এই তিনটি দেশ মাঝারি মানব উন্নয়নের কাতারে রয়েছে।

পাকিস্তান গতবারের ১৩৮তম অবস্থানেই রয়েছে। ভুটানের অবস্থান ১৪১তম থেকে ১৪০তমে উন্নীত হয়েছে। নেপালের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে ১৪২তম স্থানে। বাংলাদেশসহ এই ৪টি দেশের অবস্থান নিম্ন মানব উন্নয়নে।

প্রতিবেদন অনুসারে মানব উন্নয়ন সূচকের শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে, যার সূচক মান ০.৯৪২। ১৯৯৯ সালেও নরওয়ে এই সূচকে ১ নম্বর অবস্থানে ছিল। ২য় স্থানে রয়েছে সুইডেন। এরপর যথাক্রমে কানাডা, বেলজিয়াম ও অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৯ সালের ৫ম অবস্থান থেকে ২০০০ সালে ৬ষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে। সূচকে সর্বনিম্ন বা ১৭৩তম অবস্থানে রয়েছে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সিয়েরা লিওন।

প্রতিবেদনে বিশ্বের ১৭৩টি দেশকে উচ্চ, মাঝারি ও নিম্ন মানব উন্নয়নভুক্ত করা হয়। ৫৩টি দেশ উচ্চ, ৮৪টি দেশ মাঝারি এবং বাকি ৩৬টি দেশ নিম্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০০০ সালে মাথাপিছু জিএনপি ৭৫৫ ডলার বা তার কম এমন দেশগুলো নিম্ন মানব উন্নয়ন, মাথাপিছু জিএনপি ৭৫৬ থেকে ৯ হাজার ২৬৫ ডলার এমন দেশগুলো মাঝারি এবং মাথাপিছু জিএনপি ৯ হাজার ২৬৬ ডলার বা তার বেশি এমন দেশগুলো উচ্চ মান উন্নয়নের কাতারভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন মানব উন্নয়নের কাতারে রয়েছে

হাইলাইটস

- মানব দারিদ্র্য সূচকে ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম।
- মাথাপিছু আয় দৈনিক ১ ডলার এমন লোক মোট জনগোষ্ঠীর ২৯.১%।
- দেশের মোট আয়ের মাত্র ৩.৯% পায় সবচে' গরিব ১০% লোক।
- সবচে' ধনী ১০% লোক নিয়ে যায় মোট আয়ের ২৮.৬%।
- সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে জিডিপির মাত্র ১.৭% ব্যয় করে।
- জিডিপির মাত্র ২.২% ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে
- মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩% এখন অপুষ্টির শিকার

মানব বঞ্চনার বাংলাদেশ: অস্বীকার ও বাস্তবতা

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুবুল হকের তত্ত্বাবধানে ১৯৯০ থেকে প্রকাশিত এই মানব উন্নয়ন সূচক মানব উন্নয়নে বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থান নির্ণয়ে স্বীকৃত মানদন্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য বাংলাদেশের শাসকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো মানদন্ডই মানদন্ড নয়। তারা ঐসব মানদন্ডে নিরূপিত অবস্থান মানতে রাজি নন। এবারও ঢাকায় এই মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ইউএনডিপির এই রিপোর্ট সম্পর্কে তার দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন। 'বিভক্ত বিশ্বে গণতন্ত্র সুদৃঢ়করণ' এই শিরোনামে অনুষ্ঠিত ঐ রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

হিসেবে বক্তব্যে তার দ্বিমত প্রকাশ করতে গিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ বলেছেন, এই রিপোর্টে যা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ তারচেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি দাবি করেন যে, হাজার বছরের মধ্যে ১৯৭১ সালে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া বাংলাদেশী জাতি মাত্র ৩১ বছরের মধ্যে যতটুকু অর্জন করেছে তা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার উপায় নেই। তিনি বাংলাদেশে বিগত তিনটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার ও জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা, খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা, এনজিওদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূরীকরণে যথেষ্ট সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। আইনমন্ত্রীর মতে, দেশে সুশাসনের সব উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। তবে সেটাকে আরও উন্নয়ন করতে হলে বিরোধী দল, গণমাধ্যম, বন্ধুপ্রতিম দেশ ও সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অথচ মানব দারিদ্র্য সূচকে ৮৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। এ তথ্যই বুঝিয়ে দেয় যে আমরা মানব উন্নয়নে কতোটা পিছিয়ে আছি বা মানব বঞ্চনায় কতোটা এগিয়ে রয়েছি।

আসলে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনো রিপোর্টের সঙ্গে সরকারের ক্ষমতাসীন মহলের দ্বিমত প্রকাশের এ ধরনের ঘটনা কোনো নতুন বিষয় নয়। আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ সংযত ভাষায় এবং শালীনভাবে ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্টের বিষয়ে তার সরকারের দ্বিমত তুলে ধরলেও অতীতে এ ধরনের রিপোর্ট শাসক মহলের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলসমূহ আবার ঐসব রিপোর্টকে ভিত্তি করে সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনার বান ছুঁড়েছে। এই বিরোধী দল অবশ্য ক্ষমতায় গেলে পাল্টা অবস্থান নিয়েছে। অর্থাৎ এই দেশের শাসককুলের প্রহ্লাদরা আন্তর্জাতিক এসব মতামতকে ক্ষমতায় তাদের থাকা না থাকা দিয়ে বিচার করেন, বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়।

আইনমন্ত্রী হাজার বছরের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া বাংলাদেশী জাতির গত ৩১ বছরের যে অর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কেও আন্তর্জাতিক মতামতটি ভিন্ন। কানাডার ফ্রেজার ইনস্টিটিউট (Fraser Institute) সম্প্রতি যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর ১২৩টি দেশের মধ্যে ১০৭তম স্থানে। অথচ ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ছিল ৯৬তম স্থানে। গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমান্বয়ে পেছনের দিকে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপকতা ২ শতাংশ কমেছে। রিপোর্টের ১০ পয়েন্টের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৫.১ যা ১৯৯৫ সালের স্কোরিং-এর তুলনায় কম। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের স্কোরিং ছিল ৫.৩।

সারা বিশ্বের ৫৪টি ইনস্টিটিউটের উপাত্তের ভিত্তিতে একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতটুকু তা নির্ধারণ করা হয়। এই অবস্থান নির্ধারণে যেসব বিষয়কে মাপকাঠি

বাংলাদেশে মানব বঞ্চনার চালচিত্র

ইউএনডিপি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০০ সালে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৫৮.১ বছর, শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১ হাজারে ৫৪ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৮২ জন। উন্নতি খুঁজতে গেলে এটুকুই বলা যায় যে, ১৯৭০ সালে শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১ হাজারে ১৪৫ জন এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ২৩৯ জন ছিল। মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি ১ লাখে ৩৫০ জন।

প্রতিবেদনে অবশ্য দেখানো হয়েছে, ১৯৭৫-২০০০ সময়কালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪% থাকলেও ২০০০-২০১৫ সময়কালে এই হার গড়ে ১.৯%-এ নেমে আসতে পারে।

দারিদ্র্যের রূপটি প্রকট হয় এভাবে যে, বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু আয় মাত্র ২ ডলার এমন লোক রয়েছে মোট জনগোষ্ঠীর৭৭.৮%। ২ ডলার মানে প্রায় ১১৫ টাকা হিসাব করে মাসিক আয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। দেশের বিপুল সংখ্যক লোক এরকম আয় নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আর মাথা পিছু আয় দৈনিক ১ ডলার এমন লোক মোট জনগোষ্ঠীর ২৯.১%। অবশ্য জাতীয় দারিদ্র্যসীমা ৩৫.৬%। তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো অবকাশই নেই।

দেশের ৯৭% লোক বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে এমন তথ্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক হলেও আর্সেনিকসহ পানি দূষণের বিষয়টি প্রকট হওয়া এটা বিশ্বাস করাই কঠিন হয় বৈকি! বিপরীতে মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫৩% পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে। প্রতি ১ লাখ লোকের জন্য চিকিৎসক রয়েছে ২০ জন। এসব চিকিৎসকে আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সময়মতো পাওয়া যায় না। সরকার স্বাস্থ্যসেবা খাতে জিডিপির মাত্র ১.৭% ব্যয় করে। স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের মাথাপিছু গড় ব্যয় ১২ ডলার। ভয়াবহ দিক হলো জন্মের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর পরিচর্যা পায় এমন শিশু মাত্র ১২%।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩% এখন অপুষ্টির শিকার। ৫ বছরের কম বয়সী ওজনশূন্য শিশু ৪৮%। বছরে প্রতি ১ লাখে ৪০% লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। আবার একজন বয়স্ক লোক বছরে গড়ে ২৩২টি সিগারেট ধূমপান করে। ধূমপানের মাত্রাটি বরং একটু কমই মনে হচ্ছে।

স্বাস্থ্যের মতো শিক্ষাতেও অবস্থা নিম্নমুখী। জিডিপির মাত্র ২.২% ব্যয় হয় শিক্ষাখাতে। অথচ নেপালে এই ব্যয় হার ৩.২%, ভুটানে ৪.১%, পাকিস্তানে ২.৭%, ভারতে ৩.২%, শ্রীলঙ্কায় ৩.৪% এবং মালদ্বীপে ৬.৪%। শিক্ষার বারোটা বাজানোর যতো রকম উপায় আছে সবগুলোই বাংলাদেশে যথেষ্ট সুন্দরভাবে কাজ করছে। অবশ্য সরকারি ব্যয়ের প্রায় ১৪% যায় শিক্ষাখাতে। বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষিতের হার ৪১.৩%।

হাল জমানার অপরিহার্য প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলোর দিক থেকেও বাংলাদেশ যে কতোটা পিছিয়ে আছে তা একটিমাত্র পরিসংখ্যানই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। ১৯৯০ সালে প্রতি ১ হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ২ জন টেলিফোন সুবিধা প্রাপ্ত ছিল। ১০ বছরের মাথায় সেটি বেড়ে হয়েছে মাত্র ৪ জন। অথচ ১৯৯০ সালে ভুটানে যেখানে প্রতি হাজারে ৪ জন, পাকিস্তানে ৮ জন ও নেপালে ৩ জন এই সুবিধা পেতো সেখানে ২০০০ সালে ভুটানে ২০ জন, পাকিস্তানে ২২ জন ও নেপালে ১২ জন এই সুবিধা পায়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য মানব বঞ্চনাকে প্রবল করেছে। দেশের মোট আয়ের মাত্র ৩.৯% পায় সবচে' গরিব ১০% লোক। বিপরীতে সবচে' ধনী ১০% লোক নিয়ে যায় মোট আয়ের ২৮.৬%। অবশ্য সবচে' ধনী ২০% লোক মোট আয়ের ৪৪.৮% ভোগ করছে যেখানে সবচে' গরিব ২০%লোক পাচ্ছে মাত্র ৮.৭%। আর ২০০০ সালে বাংলাদেশ মোট ১১৭ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে, যেখানে মাথাপিছু সাহায্যের হার ৮.৫ ডলার।

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বেশ হৈচৈ করেছি আমরা। পরপর তিনজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তারপরও মজার বিষয় হলো, বিশ্বের ৬৬টি দেশের নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্লেষণে ইউএনডিপি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৬তম। অবশ্য ১৪৬টি দেশের লিঙ্গ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১২১তম।

হিসেবে ধরা হয় তা হলো আইনের শাসন, সম্পত্তির অধিকার, সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপ, ব্যবসার স্বাধীনতা ইত্যাদি। প্রথম গ্লোবাল ইকনোমিক ফ্রিডম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। দীর্ঘ এক যুগ গবেষণা করে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রেডম্যান এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তার সঙ্গে ছিল শতাধিক উচ্চ পর্যায়ের পন্ডিত ব্যক্তি। ফ্রেডম্যানের মতে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হলো উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও অন্যান্য নাগরিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রগতি।' অর্থাৎ সুশাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়াবলী। এর সঙ্গে ইউএনডিপি'র বাংলাদেশ সংক্রান্ত হিসাব মিলিয়ে দেখলে আইনমন্ত্রীর দাবি সত্ত্বেও বাংলাদেশে সুশাসনের ক্রমাবনতির চিত্রটিই ফুটে ওঠে। ইউএনডিপি'র ঢাকাস্থ প্রতিনিধিও এই রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেন, সুশাসনের অন্যতম শর্তই হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সহজভাবে লেনদেনের ব্যবস্থা। এখানে তিনি একটি নতুন বিষয় তুলে ধরেন। বিষয়টি হচ্ছে ট্রানজেকশন কস্ট বা লেনদেনের ব্যয়। সুশাসনের ইতিবাচক দিকগুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, এনজিওদের অবাধে কাজ করার স্বাধীনতা, ভিন্নধর্মের ও সংস্কৃতির লোকদের সুন্দর সহাবস্থান, পাড়া বা মহল্লা পর্যায়ে সালিসির মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তি করাসহ নানা ধরনের ইতিবাচক দিক থাকলেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নানা ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে পরিবহন ক্ষেত্রে সমস্যা, বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা ও সনাতন পদ্ধতিতে নথিপত্রের সংরক্ষণ, হরতাল, পাসপোর্টপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ও অত্যধিক ফি আদায় যে ট্রানজেকশন কস্ট বা লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি করে সেটা সুশাসনের পথে অন্তরায় কেবল নয়- সুশাসনকে জনগণের নাগালের বাইরে নিয়ে যায়।

ইউএনডিপি'র মানব উন্নয়ন রিপোর্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র মধ্যম পর্যায়ে কার্যকর রয়েছে। আইনের শাসন ও সরকারের কার্যকারিতার দিক থেকে বাংলাদেশ মোটামুটি ধরনের সফলতা পেয়েছে। আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদ অবশ্য বলেছেন, বাংলাদেশে তিন তিনটি সফল নির্বাচন হয়েছে। আর জাতীয় সংসদে বিরোধী দল না থাকলেও সংসদ কার্যকর রয়েছে। তবে বাংলাদেশের এই নির্বাচন নিয়েও যে ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল প্রতিবার বিতর্কে মাতেন এ কথাটি আইনমন্ত্রী উল্লেখ করেননি। জাতীয় সংসদে যোগদানেরও একই অবস্থা। অর্থাৎ বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় জাতীয় সংসদ বর্জন করাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গণতন্ত্র কতটুকু কার্যকর সেই প্রশ্ন যদি তোলা হয় তবে সেটা কখনই অসঙ্গত হবে না।

কেবল ইউএনডিপি'র এই রিপোর্টই নয়, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট সম্পর্কেও এদেশে সরকারে যারা থাকেন তারা একমত হতে পারেন না। তারা মনে করেন যে, ঐ রিপোর্টের মধ্য দিয়ে তাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতিটা ভিন্ন। আসলে এসব রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থাটাই বেরিয়ে আসে। এতে লজ্জার কিছু নেই। বরং ঐ অবস্থা সংশোধন করে সামনের দিকে বাড়ার একটা তাগিদ এর থেকে বেরিয়ে আসে। অথচ ঐসব রিপোর্টকে এরা একে অপরকে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতে সমস্যা উবে যায় না, বরং সমস্যার পাহাড় জমতেই থাকে।

ইউএনডিপি'র রিপোর্ট হোক অথবা অন্য যে কোনো সংস্থার রিপোর্টই হোক তাকে রাজনীতির লাভালাভের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বাস্তবভাবে দেখাটাই বরং লাভজনক। এতে দেশের মানুষ যেমন নিজেদের ভুলত্রুটি দেখতে পারেন, সে সম্পর্কে শিক্ষিত হতে পারেন, তেমনি যারা সরকারে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নেতৃত্ব দেন তারাও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ইউএনডিপি রিপোর্ট তথ্যের দিক থেকে কতখানি সঠিক সেটা তাই বিবেচ্য বিষয় নয়, রিপোর্ট যে বাস্তবতা তুলে ধরছে সেটাই বিবেচ্য। এই রিপোর্টের প্রাসঙ্গিকতাও সেই কারণেই।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট সম্পর্কেও এদেশে সরকারে যারা থাকেন তারা একমত হতে পারেন না। তারা মনে করেন যে, ঐ রিপোর্টের মধ্য দিয়ে তাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতিটা ভিন্ন। আসলে এসব রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থাটাই বেরিয়ে আসে। এতে লজ্জার কিছু নেই

বিশ্বে মানববঞ্চনা : খন্ডচিত্র

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। বর্তমানে ১৪০টি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র রয়েছে। ১০টি দেশে ৩০%-এর বেশি সাংসদ নারী। বিশ্বের ৬২% জনসংখ্যা অধ্যুষিত ১২৫টি দেশে সংবাদ মাধ্যম আংশিক বা পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু আর্থ-সামাজিক উত্তেজনা বাড়ার কারণে বহু দেশেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংকট দেখা দিয়েছে, যা মানব উন্নয়নকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমেই এমন একটি ধারণা বিস্তার লাভ করছে যে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান তথা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সুবিধা দিতে পারছে না। রাজনীতিবিদরাও প্রায়ই নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার ও মানবাধিকার লংঘনের জন্য এই অজুহাত দিচ্ছেন। অথচ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি বিকাশে কর্তৃত্ববাদী সরকার ভালো, ঐতিহাসিকভাবে এমন প্রমাণ মেলে না বলে ইউএনডিপি মনে করে। ইউএনডিপি প্রতিবেদনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুনভাবে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ১৯৯০ সালের ২৯% থেকে ১৯৯৯ সালে ২৩%-এ নেমে এসেছে। পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই হার অর্ধেক কমলেও দক্ষিণ এশিয়ায় কমেছে মাত্র ৭%। কিন্তু '৯০-এর দশক ধরে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ৫% মানুষের আয় দরিদ্রতম ৫% মানুষের তুলনায় ১১৪ গুণ বেড়েছে। আবার একই সময়ে সাব-সাহারান আফ্রিকার চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ২৪ কোটি ২০ লাখ থেকে ৩০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

ইউএনডিপি প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে আরো বেশি উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। যেসব দেশ ও জনসাধারণের ওপর এসব সংস্থার কার্যক্রম প্রভাব ফেলে তাদের কাছে এসব সংস্থাকে দায়বদ্ধ করার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭টি দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, রুশ ফেডারেশন ও সৌদি আরব বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর প্রায় অর্ধেক ভোট সংরক্ষণ করে। বাকিটা করে অন্য দেশগুলো। আবার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রতিটি দেশের একটি করে আসন ও ভোট থাকলেও কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রভাবসংবলিত ছোট্ট গ্রুপ মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এসব বৈষম্য নিরসনে ইউএনডিপি প্রতিবেদন নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো প্রথা বাতিলসহ একাধিক সুপারিশ করেছে।